ভূতের গল্প

তসলিমা নাসরিন

স্রোতস্বিনী ভালোবাসাকে

অনেক আদর

মামণি

প্রথম গল্প

এক

বাড়িতে মোট চারজন আমরা। আমি, দিদি, মা আর দিদিমা। বাবা দিল্লি থাকেন, মাসে একবার আসেন বাড়িতে। শনি আর রবিবার দুটো দিন কাটিয়ে আবার চলে যান দিল্লি। বাবাকে অনেকটা অতিথির মত মনে হয়। বাবা যখন বাড়িতে থাকেন, বেশির ভাগ সময়ই তিনি ঘুমোন। যখন জাগেন, একটি কাজই তিনি করেন, টেলিভিশনের সামনে মুখ গম্ভীর করে বসে থাকেন। বাবাকে আমার খুব আপন মানুষ বলে হয় না। বাবা চলে গেলেই বরং মনে হয়, বাড়ি বাড়ির মত আছে।

আমার সবচেয়ে ভাল লাগে দিদিকে। দিদি আমাকে প্রতিরাতে ঘুমোনোর আগে গল্প শোনায়। এত সুন্দর সুন্দর গল্প দিদি কি করে জানে, আমি বুঝে পাই না। ভুতের গল্প দিদি একেবারে পছন্দ করে না। দিদির গল্প মহাজগত নিয়ে। মহাজগতের সৃষ্টি কি করে হল, কি করে এর শেষ হবে, আমাদের এই পৃথিবীটার ভবিষ্যত কী, আমাদের সূর্যটারই বা কোথায় যাবে। এসব যে কোনও ভূতের গল্পের চেয়ে রোমাঞ্চকর। মার গল্প বলার সময় নেই। তিনি দিন রাত ব্যস্ত। সকালবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, ফেরেন সন্ধ্যায়। মা কলেজে অধ্যাপনা করেন। কলেজ ছুটির পর নিজের বইয়ের ব্যবসা দেখতে যান। বইয়ের ব্যবসা মা নতুন শুরু করেছেন। মা-ই বলতে গেলে সংসার চালান। বাবা প্রতিমাসে খুব সামান্যই সংসার খরচের জন্য দেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মা রান্নাবান্না করেন, খুব দ্রুত করেন তিনি রান্নার কাজ। আমি আর দিদি রান্নায়, ঘর গোছানোয় মাকে সাহায্য করি। মা এরকম নিয়ম করে দিয়েছেন বাড়িতে। কোনও কাজের লোক থাকবে না, বাড়ির লোকরাই বাড়ির কাজ করবে। যখন আমার পাঁচ বছর বয়স, বাবা দিল্লি চলে যান চাকরি করতে। তখন থেকেই মা এই নিয়ম তৈরি করেছেন বাড়িতে। কাজের লোক বিদেয় করে দিলেন। আর একটি মাইক্রোওয়েভ কিনলেন। তিন চারদিন এমন কি সাতদিনের জন্য রেঁধে রেফ্রিজারেটরে রেখে যান। খাবার বের করে মাইক্রোওয়েভে গরম করে যে যখন ক্ষুধার্ত, খেয়ে নেয়। আমি ইশকুল থেকে ফিরে নিজের খাবার নিজে খেয়ে নিই, দিদিও কলেজ থেকে ফিরে তাই করে। মার এই নিয়মের মধ্যে দিদিমা পড়েন না। দিদিমা আমাদের খাবার খান না। তিনি নিজের কি কি সব খাবার আলাদা চুলোয় আলাদা ভাবে নিজের হাতে রান্না করে নেন, নিজের ঘরে বসেই সেগুলো খান। দিদিমার খাবারগুলোকে দিদি বলে অখাদ্য। দিদিমার সাদা ছাড়া অন্য কোনও রঙের শাড়ি না পরা, মাছমাংস না

খাওয়ায় বাড়িতে সবচেয়ে বেশি অসন্তুষ্ট দিদি। আমিও। আমার ভাল লাগে না দিদিমার এই রূপ। দাদু মারা যাওয়ার পর হঠাৎ করে সবকিছু যেন পাল্টে গেল। দিদিমা খুব চুপ হয়ে গেলেন। যে মানুষটা এত হাসিখুশি ছিলেন, নানা জায়গায় বেড়াতে যেতেন, সেই মানুষটার মুখে তো এক ফোঁটা হাসি নেই, প্রায়ই বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন, আর সারাদিন বিছানায় শুয়ে সাদা দেওয়ালের দিকে মাছের মত চোখে তাকিয়ে থাকেন। কারও সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া কথা বলেন না। কী চমৎকার গান গাইতেন দিদিমা, এখন আর গান গান না। মন মেজাজ সব তিরিক্ষি হয়ে থাকে তাঁর। যদি বেড়োন বাড়ি থেকে, কালিঘাট নয়ত দক্ষিনেশ্বর মন্দির। ঘরে অনেকগুলো ঠাকুর বসিয়েছেন, নারায়ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব। এদের পুজো করেন।

দিদিমার হাতের রান্না খুব ভাল। নিজে কত রকমের মাছ রেঁধে যে আমাদের খাওয়াতেন। দিদিমা খেতে, খাওয়াতে দুটোই খুব ভালবাসতেন। দিদিমাকে দেখে এখন আর আমার মনে হয় না, এই আমাদের সেই আগের দিদিমা।

এখন তিনি আর আমাদের জন্য রাঁধেন না। এত বলি যে তোমার রান্না ইলিশ খেতে ইচ্ছে হচ্ছে খুব। তোমার রান্না কই মাছ, চিংড়ি মাছ। দিদিমা তবু রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ান না। থেকে থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন শুধু।

কে বলেছে তোমাকে এমন সাদা ধুতি পরে থাকতে? কে বলেছে এত সুন্দর চুলগুলো কেটে ফেলতে? কে বলেছে হাতের চুরি কানের দুল, নাকের ফুল সব খুলে রাখতে? তোমাকে দেখতে কি বিচ্ছিরি লাগে এখন! দিদিমাকে বলি। তিনি মোটেও গ্রাহ্য করেন না আমার কথা। আমাকে সামনে থেকে সরিয়ে দেন।

দিদিও বলে দিদিমাকে এখন খুব বেশি বয়স লাগে দেখতে। শুকিয়ে কাঁটা হয়ে যাচ্ছেন দিদিমা।

আমার দুই মাসি বেড়াতে আসেন প্রায়ই। মাসিরাও দেখেন, দিদিমার শরীর এবং মন দুটোই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দেখেও যে দিদিমাকে সুস্থ করার জন্য খুব যে চেষ্টা করেন, তা নয়।

দুই

অনেকগুলো মাস চলে গেল। বাবা আর দিল্লি থেকে আসেন না। আমি এক রবিবারে মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, বাবা কেন আর আসেন না।

মা বললেন, না এলে কার কী!

তা ঠিক। না এলে কার কী। আমাদের জীবন চমৎকার চলছে। বাবা ছিলেন একটি কেবল বাড়তি মানুষ। তাঁর থাকা না থাকায় বাড়ির কোনও পরিবর্তন হয় না। মাসিরা তবু বেড়াতে এলে বাড়ি মাতিয়ে রাখেন গান গেয়ে, নেচে, হো হো হেসে। বাবা এলে বাড়িটা মরে থাকে। বাবার না আসায় দিদি একবার আমাকে চুপিচুপি বলেছিল, বাবা মনে হয় আর কোনওদিন আসবে না।

না এলে কি হবে? আমার ভয় লাগছিল ভাবতে বাবা না এলে আমাদের কি অবস্থা দাঁড়াবে।

কিন্তু দিদি মোটেও ভয় পাওয়ার মেয়ে নয়। ঠোঁট উল্টে বলল, কিচ্ছু হবে না। বাবার সঙ্গে মার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। আমাদের সবাইকে দিল্লি নিতে চেয়েছিল বাবা। মা যায়নি। তাই বাবার রাগ।

মা নিজের চাকরি ছেড়ে বাবার সঙ্গে দিল্লি যেতে রাজি হননি, সেকথা আমিও জানি।

কিন্তু বাবাহীন আমাকে কেমন দেখাবে, দেখতে আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকি আর কল্পনা করি আমার চারপাশে ইশকুলের মেয়েগুলো দাঁড়িয়ে আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বলছে, দেখ দেখ ওর বাবা নেই। আমাকে কি খুব অসহায় লাগছে দেখতে?

দিদি আমার পেছনে দাঁড়িয়ে দু পাক নেচে বলে, বাবা নেই তাতে কি? তুই হলি গিয়ে দ্য প্রিন্সেস হব শ্যামবাজার। আর আমি দ্য কুইন অব কলকাতা।

দিন চমৎকার কাটছিল কিন্তু দিদিমা আমাকে দক্ষিণেশ্বর মন্দির নিয়ে গিয়ে চরণামৃত খাওয়ানোর পর ঘটনা খারাপ হয়ে গেল। জ্বর, পেট ব্যথা, ডায়রিয়া। দিদিমা ঠাকুরের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থণা করলেন যেন সুস্থ হয়ে উঠি। কিন্তু আমার অসুখ তবু সারে না। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকতে হল। ডাক্তার এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি খেয়েছি। চারটে বিস্কুট, এক গেলাস জল। এই বিস্কুট খেলে আগে কখনও এমন হয়েছে? না, হয়নি। গতকালও খেয়েছি, তার আগের দিনও। জল কিসের জল? কলের? না। ফিল্টার করা জল। এই জল খেয়ে আজ তো কারও কিছু হয়নি। আর কি খেয়েছি। দিদি বলল, মন্দিরে নিশ্চয়ই খেয়েছিস কিছু। চরণামৃত ছাড়া আর কিছু খাইনি। আমি মাথা নাড়ি। ডাক্তার বললেন, ওই চরণামৃত থেকেই হয়েছে পেটের গন্ডগোল। ওখানে বিষাক্ত জীবাণু ছিল। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে গেলেন। দিদিমা ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন আমার শিয়রে বসে। দিদি ধমকে উঠল, তোমার ঠাকুরকে তো বলেছো সুস্থ করে দিতে। কাজ তো হয়নি। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডাকতে হল। তোমার কালির পা ধোঁয়া জল খেয়েই তো এমন হল।

আমি না হয় ওষুধ খেয়ে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু দিদিমা পড়লেন অসুখে। এমন অসুখ যে হাসপাতালে নিতে হল। ডাক্তার বললেন, দিদিমার শরীরে ম্যালনিউট্রিশন।

ম্যালনিউট্রিশনের চিকিৎসা কি? ভাল খাওয়া দাওয়া। মাছ মাংস ইত্যাদি। মাছ মাংস ডিম। এবার কি হবে দিদিমা! দিদি হেসেই বাঁচে না। বাঁচতে হলে খেতে হবে। তিরিশ দিনে তেরো দিন উপোষ থাকো, সেটি আর হচ্ছে না।

ডাক্তার বললেও দিদিমা কিছু মুখে তুলবেন না। ডাক্তার ছুটি দিয়ে দিলে তিনি বাড়ি এসে আগের মতই একবেলা হবিষ্যি খাওয়া শুরু করলেন।

কেন এসব অখাদ্য খাও বল তো? তুমি যদি মারা যেতে আর দাদু বেঁচে থাকত। দাদু কি এসব খেত?

--না খেত না।

--তবে তুমি কেন খাবে? কারণ কি বল তো!

--নিয়ম পালন করি। তা না হলে লোকে মন্দ বলবে।

এতকাল পরে দিদির প্রশ্নে দিদিমার মুখ থেকে কারণটি বেরোল। এটি নিয়ম, তাই দিদিমা পালন করেন।

দিদি হেসে বলল, নিয়মটা কে তৈরি করল শুনি? সব নিয়মই কি সবাইকে পালন করতে হয় নাকি? নিয়ম যদি ভাল না হয়? নিয়ম যদি মানুষকে কষ্ট দেয়?

আমি বলি, মার তো দিল্লি যাওয়া নিয়ম ছিল। মা তো যায়নি।

দিদি বলে, সতীদাহ তো নিয়ম ছিল একসময়। এখন কি নিয়ম? তুমিই তো বলেছো তোমার ঠাকুরমাকে জোর করে তোমার ঠাকুরদার চিতায় তুলে দিয়েছিল লোকেরা। সেই নিয়ম কি এখনও আছে? কেউ তো তোমাকে চিতায় তোলেনি! বাজে নিয়মগুলো তো উঠে গেছে। যা বাকি আছে, তাও একদিন উঠে যাবে দেখে নিও।

দিদি শান্ত গলায় বলে। দিদি গম্ভীর হয়ে শান্ত গলায় মাঝে মাঝে খুব মূল্যবান কথা বলে। দিদি যে একেবারে চেঁচায় না তা নয়। যত চেঁচানো সব আমার সঙ্গে। আবার আমার সঙ্গেই তার সবচেয়ে ভাল বন্ধুত্ব। আর আমাদের দুজনের, দিদির আর আমার সবচেয়ে ভাল বন্ধু দিদিমা। কিন্তু দাদু মারা যাওয়ার পর ঠাকুরপুজো, মন্দিরে যাতায়াত, আলাদা চুলোয় নিজের অখাদ্য রাঁধা, মাটিতে বসে পাথরের থালায় ওসব খাওয়া, জপমালা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করা আর অদ্ভুত ভাবে শুয়ে থাকা দিদিমাকে বড় দুরের করে ফেলেছে। ভূতুড়েও করেছে। দিদিমাকে মাঝে মধ্যে দেখলে আমার ভয় হয়। শর্মিলা ঠাকুর দিদিমার বান্ধবী, এ বাড়িতে বেশ কবার এসেছেন। দিদিমা হাসপাতাল থেকে ফেরার পর দেখতে এসেছিলেন। ও মা! শর্মিলা ঠাকুরকে দেখতে দিদিমার মেয়ের বয়সী মত মনে হয়। ভাবাই যায় না যে দিদিমার সমবয়সী তিনি। শর্মিলা ঠাকুর আর দিদিমা কলকাতায় একসময় একই পাড়ায় থাকতেন। তখন থেকেই পরিচয়। একই ইশকুলে পড়েছেন, একই মাঠে খেলেছেন। দিদিমার বিয়ে হয়ে গেল দাদুর সঙ্গে। আর শর্মিলা ঠাকুর নেমে গেলেন সিনেমায়। দুরকম জীবন। কিন্তু বছরে একবার হলেও দিদিমা শর্মিলা ঠাকুরকে চিঠি   লিখেছেন। ব্যস্ততায় থেকেও শর্মিলা ঠাকুরও দিদিমাকে স্মরণ করেছেন। কলকাতায় এলে দেখা করে যান একবার। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর দিদিমাকে দেখতে এসে শর্মিলা ঠাকুরও দুঃখ করে গেছেন। তিনি আমাদের, আমাকে আর দিদিকে কাছে ডেকে বলেছেন, তোমাদের দিদিমাকে তোমরাই পারবে ঠিক করতে।

কি করে ঠিক করব, তা কিন্তু তিনি বলে যাননি। কিন্তু দিদির উৎসাহ খুব বেশি। দিদি বলে, দিদিমাকে ভুতে ধরেছে। ভূত ছাড়াতে হবে।

কিসের ভূত? আমি অবাক। কারণ আমি জানি, দিদি ভূত প্রেতে মোটেও বিশ্বাস করে না।

নিয়মের ভূত।

নিয়মের ভূত?

হ্যাঁ এই ভূতের উৎপাত খুব বেশি। দিদি গম্ভীর।

তিন

দিদিমা আছেন তবু দিদিমা নেই। দিদিমার এই না থাকায় আমার কষ্ট খুব বেশি। দিদিরও। মাকে বলেছি, দিদিমা কি আর আগের মত হবেন না?

মা বলেছেন, না হতে চাইলে কার কী করার আছে।

মা আশা ছেড়ে দেওয়া মানুষ। বাবার ওপরও মা এরকম আশা ছেড়ে দিয়েছেন। বাবা যদি দিল্লি থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় না আসেন, তবে কার কী ই বা করার আছে। মার সময় নেই কাউকে বদলানোর। আমার আর দিদির অঢেল সময়। রাতে পড়ার টেবিলে বসে আমরা হোমওয়ার্ক করার বদলে বুদ্ধি আঁটতে থাকি কি করে দিদিমাকে সত্যিকার দিদিমাতে ফিরিয়ে আনা যায়। আমার চেয়ে দিদির বুদ্ধি বেশি। দিদি বলে, তার মস্তিষ্ক নাকি হোমো সুপিরিয়রের, তাই। আমার বিশ্বাস, দিদি আমার চেয়ে বড় বলেই বুদ্ধি খেলে বেশি। দিদি অবশ্য বলে, বয়সে বড় হলেই যদি বুদ্ধি হত, তাহলে দিদিমার বুদ্ধি তো সবচেয়ে বেশি থাকার কথা। তা ঠিক, দিদিমা এখন বোধবুদ্ধি হারিয়ে আবোল তাবোল বকেন। অদ্ভুতুড়ে জীবন যাপন করেন। দিদিমার জীবন নির্ভর করে পঞ্জিকার ওপর। পঞ্জিকায় অমাবস্যা পূর্নিমা, একাদশি ইত্যাদি কত সব দিনে

যে তিনি উপবাস করবেন! শুধু ফল খেয়ে থাকেন। কোনও কোনওদিন এমন হয় যে সাতদিন ধরে তিনি শুধু ফলই খাচ্ছেন, কোনও ভাত তরকারি মুখে নিচ্ছেন না। কোনওদিন আবার জলও পান করবেন না। কোনওদিন আবার বহুবিচির কোনও জিনিস খাবেন না। বেগুন পটল, লঙ্কা, লাউ, সীম সব বাদ। নিজের আলাদা চুলোটি দিনে একবারের বেশি জ্বাললে চলবে না। উফ। এত সব নিয়ম কি করে যে মানুষ মনে রাখে। কি করে যে দিদিমা মনে রাখেন, আর পালন করেন, ভাবলে আমার দম বন্ধ হয়ে যায়। সব নিয়ম দিদিমার মেনে চলা চাই। সকালে ঘুম থেকে উঠে স্নান করে বাগানে চলে যাবেন ফুল আনতে। সেই ফুল নিয়ে পুজো করবেন ঠাকুরের। ঠাকুরের প্রসাদ খাবেন। আর দুপুরবেলা একবার মাত্র খাবেন। ওই অখাদ্য, ওই হবিষ্যি।

দিদির বুদ্ধিতে এক রাতে আমি একটি কাণ্ড করি। চুপিচুপি গিয়ে দিদিমার ঘর থেকে তাঁর লক্ষ্মী আর শিব ঠাকুর তুলে নিয়ে আমাদের খাটের তলে রেখে দিই। দিদি একবার বলেছিল, ফেলে দিই চল। তারপর অবশ্য বলেছে, দরকার নেই, আবার যদি কান্নাকাটি শুরু করে। থাকুক।

সকালে দিদিমা উঠে চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করলেন। কোথায় গেল ঠাকুর?

তা কে জানে, কোথায় ঠাকুর!

আমি আর দিদি ভালমানুষের মত বেরিয়ে গেলাম। আমি ইশকুলে, দিদি কলেজে। দিদি নতুন কলেজে উঠেছে। কলেজে ওঠার পর থেকেই দিদি নিজেকে আমার চেয়ে কয়েক হাজার বছরের বড় বলে নিজেকে মনে করতে শুরু করেছে। সে যাই হোক, আমিও একদিন কলেজে পড়ব। তখন দিদিও কলেজে, আমিও কলেজে। আমাকে তুচ্ছ করা মোটেও তার চলবে না।

পরদিন রবিবার। ছুটির দিন। দিদির নতুন বুদ্ধি হল, দিদিমা যা খেতে পছন্দ করেন, তা তাঁর থালায় দেওয়া হবে, দেখি কী করে তিনি না খেয়ে পারেন! দুপুরে দিদিমার ভাতের থালায় লুকিয়ে একটি বড় কইমাছ ভাজা রেখে দেওয়ার কাজ হল দিদির। দিদি মাছ নিয়ে অনেকক্ষণ রান্নাঘরে বসে আছে, কখন দিদিমা তাঁর ঘরটি ফাঁকা পাওয়া যায় এই আশায়। ঘর ফাঁকা আছে, দিদিকে এই খবরটি দেবার কাজ আমার। খেতে বসার আগে দিদিমার একবার গা ধোয়া চাই। আমি দিদিমাকে ক্রমাগত বলে যাচ্ছি, আমাদের তো খাওয়া হয়ে গেছে, তুমি খাবে কখন? যাও, গা ধুয়ে এসো।

দিদিমা বলছেন তো বলছেনই, তা না হয় খাবো। তাড়া কিসের!

তাড়া না হয় দিদিমার নেই। আমার তো আছে। আমি দিদিমাকে প্রায় ঠেলে পাঠালাম গা ধুতে।

দুটো ঠাকুর হারিয়ে বিষণ্ন দিদিমা গেলেন গা ধুতে। আর আমি দৌড়ে বেরিয়ে দিদিকে হাতের ইশারায় ডাকতেই দিদি ছুটে এসে দিদিমার ভাতে কইমাছ ভাজাটি গুঁজে দিল। দিদি আর আমি দিদিমার বিছানায় শুয়ে রইলাম কিছুই জানি না, কিছুই করিনি ভঙ্গিতে। আমরা দেখব, দিদিমা কী করেন। দিদি নিশ্চিত, দিদিমার জিভে লোভের জল গড়াবে।

দিদিমা গা ধুয়ে এসে খেতে বসেছেন। ভাত মাখতে নিলেই কইমাছটি বেরিয়ে পড়ল। ছিটকে সরে গেলেন তিনি। দিদি মুখের হাসি চেপে আকাশ থেকে পড়েছে যেন, বলল, কি হল?

এই মাছ এখানে কে রাখল? দিদিমার তিক্ত কণ্ঠ।

দিদি বলল, তোমার মা কালি একটু আগে ঘরে ঢুকেছিল, রেখে গেছে। খেয়ে নাও।

দিদিমা আমাদের দিকে ছুটে আসতেই আমরা বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে দৌড়।

এরপরের ঘটনা ঘটাতে অনেক সময় নিয়েছি আমি আর দিদি। স্বাতী মাসির কাছে শুনেছি, দিদিমা নাকি দাদুর মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণ মিশনের কাছে এক সাধুর বাড়িতে যেতেন। সেই সাধু মাকে বলেছেন, ভগবান নাকি দিদিমার ওপর খুব রেগে আছেন। এখন ভগবানকে তুষ্ট করতে বাকি জীবন যদি দিদিমা ধর্ম কর্মে মন না ঢেলে দেন, তাহলে নরকে স্থান হবে তাঁর।

সাধুর ওই কথা অমন ভাবে বিশ্বাস করলেন দিদিমা! দিদি অবাক।

মাসি বলেছেন, সাধু আগুনের ওপর হেঁটে যাওয়ার পর থেকেই সাধুর প্রতিটি কথা দিদিমা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন।

দিদির মাথায় এরপর থেকে সারাক্ষণই আগুনের ওপর কি করে মানুষ হাঁটে তা নিয়ে ভাবনা। আগুনের ওপর হাঁটলে তো পা তো পুড়ে যাওয়ার কথা। মাসি বলেছেন পা পোড়ে না, ফোসকাও পড়ে না। দিব্যি পায়ের মত পা থাকে।

মাকে জিজ্ঞেস করলে মা সোজা বলে দিলেন---এসব ঘাঁটার সময় নেই আমার। নিশ্চয়ই কোনও চালাকি আছে এর পেছনে।

কি চালাকি থাকতে পারে এর পেছনে, দিদি ভাবতে বসে আমাকে নিয়ে। আমি যে চালাকির উল্লেখই করি না কেন, দিদি এক ফুঁয়ে নাকচ করে দেয় সব। বললাম, পায়ে একধরণের মলম লাগিয়ে নেয় আগে নয়ত কোনও ইনভিজিবল আগুনপ্রুফ জুতো পরে নেয় অথবা আগুন নয়, ওগুলো আগুনের মত দেখতে অন্য কিছু। ফলস ফায়ার।

দিদি মানে না আমার মত।

নানারকম বই খুঁজে পড়তে শুরু করল দিদি। আমার সঙ্গে রাতে পড়তে বসে আর বুদ্ধি আঁটাআঁটি নেই। পড়ায় মন।

আগুনের ওপর হাঁটার চালাকিটি বের করতে পারলে দিদিমার ভুত দুর হবে, দিদির বিশ্বাস।

আগুনের ওপর হাঁটার ব্যাপারটি যে কেবল দিদির মাথায় গেড়ে বসেছে, তা নয়। আমার মাথা থেকেও মোটেও এটি নড়ছে না। অর্ধেক রাত পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবি কি করে এটির ব্যাখ্যা দিদিমাকে দেওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কথা হলে দিদিমা সাধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সাধু সাধারণ মানুষ নয়। রীতিমত ভগবান বা ভগবানের দুত এরকম কিছু একটা।

সাধুকে দেখার আগে দিদিমার যে ভগবানে বিশ্বাস ছিল না, তা নয়। ছিল, কিন্তু তা কখনও এমন মাত্রাছাড়া ছিল না। আমাদের ঘরে কোনও ঠাকুর ছিল না। পুজোর সময় বিস্তর খাওয়া হত, আনন্দ হত। ওটুকুই। দিদিমার মত ভগবানে আমিও বিশ্বাস করতাম, দিদি আমার মাথা থেকে ভগবানের ভূত ছাড়িয়েছে। রাতে বারান্দায় বসে আকাশের তারা দেখতে দেখতে, নয়ত বিছানায় শুয়ে খোলা জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে, পড়ার টেবিলে বসে কাগজে ছবি এঁকে এঁকে মহাকাশ আর মহাজগতের গল্প শুনিয়েছে দিদি আমাকে। কি করে একটি বিন্দু থেকে এত বড় মহাজগতটি হল আর কি করে মহাশূন্যে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্রগুলো ভাসছে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এদের ঘোরাচ্ছে, আবার ভাসতে ভাসতে ঘুরতে ঘুরতে সরে যাচ্ছে দুরে। কত দুরে কে জানে। একদিন আমাদের সূর্যটার পেটের হাইড্রোজেন আর হিলিয়ামগুলো পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। সূর্য নিভে যাবে, পৃথিবী আর পৃথিবী থাকবে না, পৃথিবীর সব প্রাণীগুলো মরে যাবে। এই পৃথিবীর পরিবেশেই প্রাণের জন্ম ঘটাতে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর জন্মের শুরু থেকে কত প্রাণের জন্ম হল, কত প্রাণ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সারভাইভেল অব দ্য ফিটেস্ট যাকে বলে। মানুষও লক্ষ লক্ষ প্রাণীর মধ্যে এক ধরণের প্রাণী। মানুষও একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মানুষ নামক প্রাণী অন্য প্রাণীদের চেয়ে ভাল মস্তিষ্ক ধারণ করেছে। তাই জানতে চেয়েছে কোত্থেকে এই পৃথিবী এল, কি করে এল, কে তৈরি করল। তখনই ভীতু মানুষের মনে ভগবান-ভাবনা এল। নিশ্চয়ই কোনও এক শক্তি এইসব সৃষ্টি করেছে। সেই ভাবনাগুলো থেকে মানুষ ধর্ম তৈরি করেছে। আহ, দিদি এত চমৎকার করে বুঝিয়ে বলে যে আমারও ইচ্ছে করে দিদির মত হতে। আমার কোনও প্রাইভেট টিউটর নেই, ইশকুলের আর সব ছেলে মেয়েদের যেমন আছে। আমার টিউটর দিদি। পড়া বুঝতে, মা বলে দিয়েছেন, দিদির কাছে যেতে। আমাদের দুজনের আড্ডাই অবশ্য বেশি হয় পড়ার চেয়ে বেশি। তবে দিদিকে আমি টিউটর বলেই মানি। দিদির সঙ্গে গল্প করে যা কিছু আমি শিখেছি, এত বছর ইশকুলে গিয়েও এত শিখিনি।

তবে কি পূণর্জন্ম বলতে কিছু নেই?

দিদি আমার মাথায় চাটি মেরে বলে, পূর্নজন্ম থাকবে কেন? কি কারণে?কোনও কারণ আছে?মৃত্যুভয়ই মানুষুকে পুনর্জন্মের ভাবনা দিয়েছে। এ একধরণের সান্ত্বনা।

তবে কি লাভ জন্মে? যদি মরেই যাবো? মানুষের জন্মের কথায় আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি।

আমার প্রশ্ন শুনে দিদি বলেছে, কোনও লাভ নেই। যতদিন বেঁচে থাকবি, আনন্দ করে যাবি।

দিদির এই কথাটি আমাকে বেশ আনন্দ দিয়েছে। আমার খুব আনন্দ করতে ইচ্ছে করে। ইশকুলের মেয়েরা যেমন এক দঙ্গল বান্ধবী নিয়ে হিন্দি ছবির গান গায় আর নাচে, সেরকম আনন্দ আমার মোটেও ভাল লাগে না। মা একবার আমাদের সবাইকে নিয়ে নৌকো করে গঙ্গায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, সে যে কি ভাল লেগেছিল নৌকোয় ঘোরা। নদীর পাড়ে যেতে আমার খুব ভাল লাগে। নদীগুলো সব গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে ভাবতেও ভাল লাগে। আমার অবশ্য সমুদ্রও দেখা হয়েছে। দিদিমা বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন দীঘায়। দিদিমা কম ঘুরে বেড়ানো মানুষ ছিলেন না। দাদু ছিলেন অধ্যাপনা নিয়ে ব্যস্ত, দিদিমা বাচ্চাদের

ইশকুলে পড়াতেন, ইশকুলের চাকরিটি ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে দাদু সঙ্গে যেতে না পারলে একাই চলে যেতেন যেখানে যেতে ইচ্ছে করে। আমাকে আর দিদিকে নিয়ে একবার চলে গেলেন দার্জিলিং। মারও যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু, ওই এক ব্যাপার, সময় হয়নি। দিদিমা অনেকদিন বলেছেন, বাড়ির সবাইকে নিয়ে একবার বাংলাদেশ ঘুরে আসবেন। ময়মনসিংহে ছোটবেলার বাড়িঘর নদী আর গাছপালা দেখতে যাবেন। আমি আর দিদি সে যে খুশি। দাদুও বলেছিলেন, যাবেন। কোথায় দাদু ছুটি নেবেন কলেজ থেকে, তা না, টুপ করে হৃদপিণ্ডের রক্তনালী বন্ধ হয়ে গেল, আর তিনি চোখ বুজলেন। এত ডাকার পরও দাদু আর জাগলেন না। দাদুর অমন চলে যাওয়ায় বাংলাদেশ বেড়াতে যাওয়ার ব্যাপার বন্ধ হয়ে গেল।

দু বছর হয়ে গেল দাদু নেই। আমিই বাংলাদেশে যাওয়ার পরিকল্পনার কথা সবাইকে প্রায়ই মনে করিয়ে দিই। দিদিমা শুনে রাগ করেন, বলেন, ভগবানের নাম নে, এত নাচানাচি করিস না।

ভগবানের নাম নেব কেন? ভগবান কি, কেন, কোথায়? ওরকম মাটির পুতুল তো আমিও ইচ্ছে করলে বানাতে পারি।

আমার কোনও প্রশ্নের উত্তর দিদিমা দেন না। বিরক্ত হয়ে গীতাপাঠে মন দেন।

ওই সাধুবাবাই দিদিমার মাথাটা খেয়েছে। আমি নিশ্চিত।

সাধুবাবার ওপর আমার রাগ হয় খুব। সাধুবাবা মোটেও সাধু নয়, শয়তান একটা--- দিদির এই কথায় দিদিমা এমন রেগে গিয়েছেন একদিন যে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললেন, মেয়েদুটোকে তিনি মানুষ বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মেয়েদুটো মানুষ না হয়ে ঘোড়া হয়েছে।

চার

দিদির বই পড়া আপাতত বন্ধ। কিন্তু কলেজ থেকে দেরি করে ফিরতে শুরু করল। কি ব্যাপার? দিদি আমার কানে কানে একদিন বলল, সে তার এক বন্ধুর সঙ্গে এক জায়গায় যায়। তবে কোন বন্ধুর সঙ্গে কোন জায়গায় যায়, আর সে জায়গায় সে কি করে, কিছুই বলে না। বাড়ির সবাইকে নাকি খুব শিগগিরই দিদি চমকে দেবে। দিদির চমকের অপেক্ষায় আমি বসে থাকি। সেই চমকটি সাতদিনের মাথায় পাওয়া গেল। রাত নটার দিকে দরজায় শব্দ। দিদি দৌড়ে গেল দরজা খুলতে। দুটো ছেলে দরজার ওপারে। ঘরে ঢুকলো না ছেলে দুটো। উঁকি দিয়ে দেখে একটিকে চিনতে পারি, পলাশ পাল। দিদির কলেজের বন্ধু এই ছেলে। দিদির সঙ্গে ওদের কি কি সব কথা হল নিচু গলায়। এরপর ওদের নিয়ে দিদি বেরিয়ে গেল দরজার বাইরে। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে দেখি, বাড়ির বাইরের অন্ধকার মাঠটিতে ছেলেদুটোর সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে দিদি। আমার একটু ভয় ভয় লাগে। ওরা কি দিদিকে ধরে নিয়ে যাবে এখন? মাকে খবর দেব

কি দেব না ভাবছি। অমনি দিদি ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, কাউকে বলবি না যে দুটো ছেলে আমার কাছে এসেছিল। দিদির চোখে মুখে উত্তেজনা। খানিকটা কাঁপছেও।

কি হয়েছে, আমাকে বল। না হলে আমি বলে দেব।

তোকে বলব। পরে বলব। অপেক্ষা কর।

কতক্ষণ অপেক্ষা করব?

যতক্ষণ অপেক্ষা করতে বলি, ততক্ষণ।

দিদি সারাক্ষণই অস্থির পায়চারি করে ঘরে। আর বার বারই জানালা দিয়ে বাইরে তাকায়। এর মধ্যে আবার জামাও পাল্টে নিল, সুন্দর একটি লাল জামা পরল, ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাল, চুল বাঁধল।

কোথাও যাচ্ছ নাকি?

দিদির ঠোঁটে হাসি। বলল, হ্যাঁ যাচ্ছি।

কোথায়?

বলব না।

দিদির এই রহস্য আমার ভাল লাগে না। আমাকেই সব বলত সে, আমি তার এমনই আপন ছিলাম। এখন দেখি আমাকেও গোপন করে অনেক কিছু। কি জানি, ওই ছেলেদুটোর সঙ্গে দিদি বোধহয় চলেই যাবে এ বাড়ি ছেড়ে। আমার খুব কান্না পায়। পলাশ পালের সঙ্গে দিদির খুব বন্ধুত্ব। আগে দুদিন এসেছে এ বাড়িতে। পলাশ পালকে দিদিমা মোটে পছন্দ করেন না। বলেন অচ্ছুত। ও নাকি নিচু বংশের ছেলে। সেই অচ্ছুতকেই কি বিয়ে করে চলে যাচ্ছে দিদি! কে জানে! মার কাছে গিয়ে বলব, সাহস হয় না।

ঘন্টা খানেক পর দিদি বলল, চল যাবি আমার সঙ্গে। আমি ঠিক বুঝে পেলাম না কোথায় যাব, কেন যাব। কিন্তু সন্তর্পনে দিদির পেছনে বেরিয়ে দেখি বাইরের মাঠে   ছেলে দুটো বসে আছে, সামনে গনগনে আগুনের কয়লা।

দিদি সোল্লাসে চেঁচিয়ে বলল, এখন আগুনের ওপর হাঁটা হবে। যা মাকে আর দিদিমাকে ডেকে নিয়ে আয়।

বলে কি দিদি! মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি। আমি বলি, কে হাঁটবে আগুনে? সাধুবাবা?

আরে বোকা। সাধুবাবা হাঁটবে কেন? হাঁটব আমি।

তুমি?

হ্যাঁ আমি। বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি!

আমি কান্না-গলায় বলি, তুমি তো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মোটেও পুড়ব না। যা তুই ওদের ডেকে নিয়ে আয়।

আমি দৌড়ে ভেতরে গিয়ে মাকে আর দিদিমাকে খবর দিই, দিদি আগুনের ওপর হাঁটবে। এক্ষুনি এসো।

মা ছুটে এলেন। দিদিমা ভগবান ভগবান বলে কাঁদতে কাঁদতে বেরোলেন। আমরা যখন বাইরে, পলাশ পাল হাঁটছে আগুনের ওপর। এরপর দিদি উদ্যত হলেই দিদিমা দৌড়ে গিয়ে দিদিকে জাপটে ধরলেন।

পাগল হয়েছিস নাকি? মরতে ইচ্ছে হচ্ছে?

দিদি হেসে ওঠে। বলে, মরব কেন? আমার কিচ্ছু হবে না।

ভগবানে বিশ্বাস নেই, আর এসব করতে চাইছিস, কে বাঁচাবে তোকে?

বাঁচাবে ফিজিক্স। আমার ফিজিক্সে বিশ্বাস আছে।

বলে দিদিমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দিদি দিব্যি হাঁটতে লাগল আগুনের ওপর।

আমি ভয়ে চোখ বুজে অন্য দিকে ফিরে থাকি। মা চিৎকার করছেন দিদির নাম ধরে। বুলবুলি থাম। বুলবুলি থাম।

পুড়ে ছাই হয়ে পড়ে থাকা দিদিকে দেখব বলে ভয়ে ভয়ে যখন চোখ খুলি, দেখি আস্ত দিদি মার কোলে বসে হি হি করে হাসছে। মা তার পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর দেখছেন পুড়েছে কি না। আমি ছুটে যাই দেখতে। না পোড়েনি।

টুনটুনি তুই যা না। যা, হেঁটে আয়। কিচ্ছু হবে না। আকাশের তারার দিকে তাকিয়ে থাকবি। দিদি আমাকে বলে।

দিদিমা আমাকে শক্ত করে ধরে রাখেন। আমার খুব হাঁটতে ইচ্ছে হয়। দিদির মত সাহস ইচ্ছে করে আমারও থাকুক।

এরপর দিদি আরও একবার হাঁটল। ছেলেদুটো আরও দুবার।

দিদিকে আমার খুব ঈর্ষা হয়। দিদিকে ভালও বাসি খুব।

সারারাত আমার ঘুম আসেনি। দিদিকে বারবারই জিজ্ঞেস করেছি, কি করে হাঁটলে, পা পুড়ল না কেন?

দিদি হেসে বলে, কাঠের আগুন থেকে শরীরে তাপ ট্রান্সমিট করতে কিছুটা সময় নেয়। এক সেকেন্ড সময় নেয়। তুই কিন্তু পা টা এক সেকেন্ড হওয়ার আগে সরিয়ে ফেলছিস। খুব সোজা। আর কাঠের কয়লা একটু আঁকাবাঁকা থাকে, তোর পায়ের তলে পুরো কয়লা তো পড়ছে না। কাঠ বলেই পারবি। লোহা হলে হাঁটতে পারবি না। লোহা থেকে তাপ দ্রুত ছড়ায়। কাঠ আর লোহার তাপ পরিবহন ক্ষমতা ভিন্ন। এ ছাড়াও, পা ধুয়ে নিবি আগে, ভেজা পায়ে তুই বালুর ওপর খানিকটা হেঁটে নিবি, এতে তোর পায়ের চামড়ায় সরাসরি আগুনটা লাগছে না অত, বালু আছে বলে।

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে, মাথা নেড়ে দিদির হাত চেপে ধরে অনুনয় করি, দিদি আরেকবার আয়োজন কর প্লিজ, আমিও হাঁটব।

আগে বল, তুই ভগবানে বিশ্বাস করিস, নাকি ফিজিক্সে?

দ্রুত উত্তর দিই, ফিজিক্সে।

তাহলে তুই পারবি।

ভগবানে বিশ্বাস করলেও তো লোকে পারে। সাধুবাবা তো পারে।

সাধুবাবা তো লোককে ফাঁকি দেয়। বলে, তাকে নাকি ভগবান ক্ষমতা দিয়েছে। এখন তো বুঝলি, আসলে সে কি করে করে?

দিদিমা কী বুঝেছে?

নিশ্চয়ই বুঝেছে। দেখবি দিদিমা সারারাত ঘুমোচ্ছে না। ভাবছে।

চুপিচুপি দিদিমার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি ঠিকই দিদিমা ঘুমোচ্ছেন না। বসে আছেন। ভাবছেন।

পাঁচ

মহাভারতের নয়, বরং বড় মজাদার মহাজগতের কাহিনী শুনিয়ে দিদি আরও ভাবাতে থাকে দিদিমাকে। শেষ পর্যন্ত আরও একটি কাণ্ড ঘটে বাড়িতে। পলাশ পাল আর তার সেই বন্ধুটি যারা আগুনের ওপর হেঁটেছিল, বাড়িতে বেড়াতে আসে, চা খাওয়ার আমন্ত্রণ। দিদিই ডেকেছে। দিদিমাকে ডেকে এনে বসানো হল ওদের সামনে। দিদিমাকে দিব্যি আপন করে নিল ওরা। খুব সুন্দর করে বুঝিয়ে দিল কেন যে কোনও মানুষই আগুনের ওপর হাঁটতে পারে। পলাশ বলল, দিদিমা, আপনাকে হাঁটতে হবে আগুনে। হাঁটবেন তো!

দিদিমা হাসলেন। অনেকদিন পর দিদিমাকে হাসতে দেখলাম।

পলাশ পাল দিদিমাকে নেমন্তন্ন করল তার বাড়িতে। পঁচিশে নভেম্বর তার জন্মদিন। সেই জন্মদিনে দিদিমাকে যেতে হবে। দিদিমা বললেন, আমি তো কোথাও যাই না। আমার বোধহয় যাওয়া সম্ভব হবে না।

পলাশ বলল, কি বলছেন দিদিমা। সম্ভব হবে না কেন! আপনি সম্ভব করলেই সম্ভব হবে।

পঁচিশে নভেম্বর এলে আমি বারবার দিদিকে বলি, চল জোর করে দিদিমাকে থানের বদলে কোনও রঙিন শাড়ি পরিয়ে নিয়ে যাই পলাশদার বাড়ি।

দিদি গম্ভীর গলায় বলে, না, কখনও জোর করবি না। নিজে নিজেই একদিন পরবে, সেটার জন্য পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

আমি আর দিদি তৈরি হয়ে নিই। কিন্তু দিদিমা মোটেও গা তোলেন না। তিনি যাবেন না, ধরেই নিয়েছিলাম। আচমকা পলাশ তার নিজের দিদিমা আর ছোটবোন তুলসিকে নিয়ে বাড়িতে উপস্থিত। সে নিজেই নাকি নিয়ে যাবে আমাদের সবাইকে। দিদিমা দিদিমা বলে ডাকতে ডাকতে পলাশরা ঢুকে গেল দিদিমার ঘরে।

পলাশের দাদু মারা গেছে, কিন্তু ওর দিদিমা বদলে যাননি, রঙিন শাড়ি পরেন, গয়না পরেন, লিপস্টিক মাখেন। পলাশের দিদিমা বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে একঝাঁক আলো এনে হৈ চৈ করে আমাদের দিদিমাকে বিছানা থেকে তুললেন। দিদিমার কাঁধে দুহাত রেখে মিষ্টি হেসে বললেন, চলুন আমার নাতির জন্মদিনে সবাই মিলে একটু আনন্দ করি। এভাবে অন্ধকার ঘরে মনমরা পড়ে থাকলে বেঁচে কী লাভ।

দিদিমা উঠলেন। শাড়ি পরলেন। যাবার পথে গাড়ি থেকে নেমে জুতোর দোকান থেকে পলাশের পায়ের মাপে সুন্দর এক জোড়া জুতো কিনলেন। পলাশের জন্মদিনে উপহার। জুতো পেয়ে পলাশ মহাখুশি। পলাশের বাড়িতে সবাই আমাদের দিদিমাকে নিয়ে মেতে থাকে। খাবার টেবিলে বসে পলাশের দিদিমা আমাদের দিদিমার থালায় মাছ মাংস তুলে দিয়ে বলছেন, খান তো। খাবার জিনিস খাবেন না কেন! আমি খাচ্ছি না! আমি নিজে রেঁধেছি এসব। ফেলে দেবেন না কিন্তু।

দিদিমাকে লক্ষ করি, তিনি লজ্জা পাচ্ছেন। এতগুলো মানুষ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে!

পলাশের দিদিমা এক এক করে সাতজন বিভিন্ন বয়সের মহিলাকে ডাকলেন কাছে। বললেন, দেখুন, এদের স্বামীও মারা গেছে। এরা কি হবিষ্যি খাচ্ছে? এরা কি থান কাপড় পরে আছে? স্বামী মারা গেছে, এটা তো এদের দোষ নয় যে এদের প্রায়শ্চিত্য করতে হবে! ভুগতে হবে। শাস্তি পেতে হবে। স্বামীর জীবনটি স্বামীর ছিল। এদের জীবন এদের। জীবন যার যার, তার তার।

দিদিমা বলতে নেন, তবু তো সমাজের নিয়ম বলে একটা কথা..

দিদিমার কথা শেষ হয় না। দিদি বলে, শান্ত গলায়, ভাল নিয়মগুলো মানবো, পচা নিয়মগুলো মানবো না। মানুষ কি সেই আদিকাল থেকে একই নিয়ম মেনে চলে। নিয়ম তো বদলায়।

দিদিমা মাথা নিচু করে, হেসে, মুখে ভাজা তপসে মাছের একটি টুকরো তুললেন। দিদিমাকে দেখে আমার এত ভাল লাগল। ইচ্ছে করল, গালে দুটো চুমু খাই তাঁর। শুকিয়ে দড়ি দড়ি হয়ে গেছেন, হাড় বেরিয়ে এসেছে গালের, গলার, বুকের। খেলে, ডাক্তার তো বলেছেনই, দিদিমার অসুখ সারবে। খাওয়া দাওয়ার পর সকলের অনুরোধে দিদিমা পাঁচটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলেন। আমি দিদিমাকে জড়িয়ে ধরে দুটি কেন, তখন দশটি চুমু খেয়েছি। আদর পেয়ে দিদিমার চোখে জল।

এরপর আমরা ঘটা করে দিদিমার জন্মদিনও পালন করেছি। দিদিমা নীল একটি সিল্কের শাড়ি পরেছেন। হাতে কানে আগের সব গয়না পরেছেন। তাঁর পুরোনো বান্ধবীদের সবাই এসেছেন। পলাশের দিদিমা এখন নতুন বান্ধবী, তিনিও এসেছেন। মাসিরা এসেছেন। শর্মিলা ঠাকুর আসতে পারেননি, কলকাতায় থাকলে নিশ্চয়ই আসতেন। দিদিমার মুখ থেকে হাসি সরছে না। তিনি গুণগুণ করে গান গাইছেন। আনন্দ করছেন। দিদিমা আর মা দুজন মিলে আলুপোস্ত, তেলকই, চিংড়ির মালাইকারি আর পাঁঠার মাংস রেঁধেছেন। সাহায্যে আমি আর দিদি। দিদির ইচ্ছে ছিল গরুর মাংস খাবে। কিন্তু বাজার খুঁজে গরুর মাংস

পাওয়া যায়নি। তবে দিদিমা কথা দিয়েছেন গরুর মাংস খাওয়াবেন একদিন। বললেন, শর্মিলারও প্রিয় গরুর মাংস, খুব নাকি স্বাদ।

আমাদের খাওয়া হল। খাওয়ার পর রাবড়ি আর পাঁচ রকমের মিষ্টি। উফ, এত খেয়ে আমার পেট ফেটে যাওয়ার মত অবস্থা। দিদিমার জন্মদিন পালন করার বুদ্ধিটি প্রথম আমার মাথায় এসেছিল। দিদি কখনও দাবি করতে পারবে না যে এটিও তার বুদ্ধিতে হয়েছে।

ছয়

দিদিমা এখন আবার আগের মত। মাঝখানে যে ভূতটি তাঁর ঘাড়ে চেপেছিল, সেটি বিদেয় হয়েছে। দিদিমার চুল বড় হচ্ছে। ঘ্যাচ ঘ্যাচ করে আর কাটেন না সুন্দর চুলগুলো। এখন আর তিনি মন্দিরে মন্দিরে দৌড়োন না। ঠাকুর পুজো বন্ধ। জপতপ বন্ধ। গীতাপাঠ বন্ধ। দিদির কাছ থেকে ফিজিক্স বই চেয়ে নিয়ে পড়ছেন। বিজ্ঞানের অন্যান্য বইও ধার চেয়েছেন পড়ার জন্য। ব্রায়ান এল সিলভারের লেখা দ্য এসেন্ট অব সায়েন্স বইটি দিদিমার অনুরোধে দিদি কথা দিয়েছে অনুবাদ করে শোনাবে। রবিবার এলেই দিদিমা আমাদের নিয়ে বাইরে বেরোচ্ছেন। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের রাস্তায় ঘোড়ায় চড়ে এলাম। টাউন হলে কলকাতা প্যানারোমা দেখে এলাম। নন্দনে ক্লাসিক্যাল মিউজিক শুনে এলাম। রবীন্দ্রসদনে নাচের অনুষ্ঠান দেখে এলাম। কত কী! দিদিমাকে এখন আমাদের আগের দিদিমা লাগে। হাসিখুশি। প্রাণবন্ত।

দিদিমা তাঁর নতুন দুটি ইচ্ছের কথা আমাদের জানিয়েছেন সম্প্রতি। একটি, তিনি আগুনের ওপর হাঁটবেন। দ্বিতীয়টি, সামনের মাসে আমাদের ইশকুল কলেজ ছুটি হলে আমাদের নিয়ে তিনি বাংলাদেশ বেড়াতে যাবেন। ময়মনসিংহ শহরে ঈদুল আরা বেগম নামে তাঁর এক অভিন্নহৃদয় বান্ধবী ছিল। এক লতায় পাতায় আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলে সেই পুরোনো বান্ধবীর খোঁজ পেয়েছেন তিনি। চিঠি লিখেছেন। চিঠির উত্তরও এসেছে। তাঁর সেই বান্ধবীর বাড়িতে আমরা থাকব।

এই মুহূর্তে আমার মত সুখী কেউ নেই।

এখন প্রতিরাতে আমাদের দুজনকে, দিদিকে আর আমাকে, গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়ান দিদিমা। দিদিমার ছোটবেলার সব গল্প। গল্প শেষ হলে তিনি আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু খেয়ে বলেন, গুড নাইট দ্য প্রিন্সেস অব শ্যামবাজার, আর দিদির কপালে চুমু খেয়ে, গুড নাইট দ্য কুইন অব কলকাতা।

****